তত্ত্ববিদ্যা

দ্বিতীয় খণ্ড—ভোগ কাণ্ড।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক

প্রণীত।

ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত।

১৭৮৯ শক।

কার্ত্তিক।

PRINTED BY KALLY DOSS CHUCKERBUTTY.

তত্ত্ববিদ্যা।

ভোগ কাণ্ড।

উপক্রমণিকা।

আমরা জ্ঞানেতে যে সকল সত্য উপলব্ধি করিয়া থাকি, ভাবেতে সেই গুলি উপভোগ করিয়া পরিপাক করিতে পারিলে, তবে আমাদের ইচ্ছাতে কর্ম্ম-করিবার বল জন্মে; এই রূপ, জ্ঞানকাণ্ডের পরে ভোগ কাণ্ড সহজেই সমাগত হইতেছে।

পূর্ব্ব খণ্ডে সংশয় হইতে প্রত্যয়ে উত্তীর্ণ হইবার সেতু সন্নিবেশিত হইয়াছে; এক্ষণে সেই সুরম্য প্রদেশে উপনীত হইয়া তথাকার ফল ভোগ করিবার যে রূপ পদ্ধতি, তাহা-রই আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

তত্ত্ব-সকল উপলব্ধি করা জ্ঞানের কার্য্য; ভাবের কার্য্য কি?—না, সেই গুলিকে

আদর্শ রূপে বরণ করত তাহাতে জীবন সমর্পণ করা,—ইহারই নাম উপভোগ; এক্ষণে জ্ঞানের উপলব্ধি ব্যাপারকে আ-লোচনা-ক্ষেত্র হইতে অব্যাহতি দিয়া, তাহার স্থলে ভাবের উপভোগ ব্যাপা-রকে অভিষেক করা যাইতেছে। পূর্ব্বে জ্ঞানের মূল-তত্ত্ব সকল লইয়া আন্দোলন করা হইয়াছে, এক্ষণে ভাবের মূল-আদর্শ সকলের প্রতি মনোনিবেশ করা যাইতেছে।

বর্ত্তমান বিষয় দুই রূপে অনুশীলিত হইতে পারে ;—এক, ভাবকে জ্ঞান হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া উহাকে স্বতন্ত্র রূপে বিবেচনা করা, অপর, জ্ঞানের সহিত ভাবের পদে পদে যোগ রক্ষা করিয়া চলা। আমরা শেষোক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করিতেই ব্রতী হইয়াছি। কারণ, যদি আমরা এরূপ জানিতাম যে জ্ঞা-নের সহিত ভাবের কোন সম্পর্ক নাই, তাহা হইলে অবশিষ্ট কেবল কুতূহল-নিবৃত্তি রূপ প্রলোভন কখনই আমাদিগকে সেই কঠোর জ্ঞানালোচনাতে প্রবৃত্ত করিতে পারিত না ; প্রত্যুত, ইহার পরে ভাব-ক্ষেত্রে উত্তীর্ণ

হইব, এই ভাবিয়াই আমরা সমুদায় জ্ঞান-পথ মনের সন্তোষে অতিবাহন করিয়াছি।

প্রথম অধ্যায়।

পূর্ব্ব খণ্ডের প্রথমেই ইন্দ্রিয়-বোধ বুদ্ধি, এবং প্রজ্ঞার মধ্যে এই রূপ ভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ইন্দ্রিয়-বোধ অনুসরণ করিয়া আমরা বিষয় উপলব্ধি করি, বুদ্ধি অনুসরণ করিয়া আমরা বিষয়ীকে উপলব্ধি করি, এবং প্রজ্ঞা অনুসরণ করিয়া আমরা পরমাত্মাকে উপলব্ধি করি। অতএব প্রজ্ঞা যে কেবল ইন্দ্রিয় বোধ হইতেই পৃথক্ স্বভাব এমন নহে, উহা বুদ্ধি হইতেও পৃথক্ স্বভাব; তাহার প্রমাণ এই যে মূল-তত্ত্ব সকল কোন রূপেই আমাদের বুদ্ধিতে আ-ইসে না, কিন্তু প্রজ্ঞাতে সে সকল নিশ্চয় রূপে উপলব্ধি হইয়া থাকে। প্রজ্ঞার আদি এবং অন্ত সেই মূল সত্য, যাঁহার সুন্দর মঙ্গল ছটাতে আধ্যাত্মিক ভৌতিক সমুদায় জগৎ বাস্তবিক সত্য হইয়া দীপ্তি

পাইতেছে। বাস্তবিক সত্যের এই যে ভাব, ইহা কি আমাদের বুদ্ধির সিদ্ধান্ত? আমরা কি আপনারা স্বকীয় বুদ্ধি-প্রভাবে সত্য হইয়াছি—না বহির্জ্জগৎকে বুদ্ধি প্রয়োগ দ্বারা সত্য করিয়াছি? অতএব আর সকলই যদি বুদ্ধি দ্বারা স্থির করা সাধ্য হয়, তথাপি আমি বাস্তবিক কি না, জগৎ বাস্তবিক কি না, ইহা স্থির করিতে গিয়া বুদ্ধির সমুদায় আড়ম্বর নিষ্ফল হইয়া ভূতলে নিপতিত হয়। অতএব মূল সত্যকে যিনি যত টুকু লাভ করেন, তাহা তাঁহার কৃপা ব্যতিরেকে কেবল মাত্র আত্ম-চেষ্টা দ্বারা কখনই না। অপিচ মূল সত্যকে যখনই যিনি বুদ্ধির বশে আনয়ন করিতে গিয়াছেন, তখনই তিনি তাহার এই ফল পাইয়াছেন যে, জাগ্রৎ জীবন্ত বাস্তবিক সত্যের পরিবর্ত্তে কোথাকার এক স্বপ্নবৎ নির্জীব কাল্পনিক সত্য সম্মুখীন দেখিয়া সত্যের নামে তাঁহার বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে। কিন্তু সত্য-স্বরূপ যিনি, তিনি দূরে যান নাই, তিনি নিকটেই আছেন, আমরাই আপন বুদ্ধিমত্তায় অন্ধ হইয়া মনে

কিরতেছি যে আমরা তাঁহা হইতে দূরে আছি, আমাদের উপর তাঁহার চক্ষু নাই— তাঁহার হস্ত নাই। পরমাত্মাকে জানা না জানা মনুষ্যের ইচ্ছাধীন নহে, সকল মনুষ্যেরই অগত্যা তাঁহাকে জানিতে হয়, এমনকি তাঁহাকে জানাতেই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব; কিন্তু তাঁহাকে আমরা অতি অল্প পরিমাণেই জানি, সুতরাং তাঁহাকে তদপেক্ষা অধিক করিয়া জানিতে আমাদের স্বভাবতঃই ইচ্ছা হয়; এই প্রকার ইচ্ছা চরিতার্থ করিতে হইলে, তন্নিমিত্তে তাঁহারি নিকট প্রার্থনা করা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক; নতুবা আমরা যদি আপন বলে তাঁহাকে জানিতে যাই, তবে অবশ্যই শূন্য হস্তে ফিরিয়া আসিব, ইহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। এখনকার জিজ্ঞাস্য এই যে, মূল সত্য পরমাত্মা যখন আমাদের প্রজ্ঞাতে দেখা দেন, তখন আমাদের হৃদয়ে কি রূপ ভাবের উদ্রেক হয়? তখন একান্ত নির্ভরের ভাব আসিয়া আমাদের সমুদায় আত্মাকে অভিভূত করে; আমরা অপূর্ণ, এবং পরমাত্মা পূর্ণ, তখন ইহা

উজ্জ্বলতর রূপে প্রকাশ পাইতে থাকে। এ নির্ভরের ভাব কি প্রকার? ভৃত্যেরা যেমন উপজীবিকার্থে প্রভুর আশ্রয়ে নির্ভর করে, সেইরূপ? না অন্য কোন রূপ? যথার্থ যিনি ঈশ্বরের অনুরক্ত ও ভক্ত, তিনিই এ প্রশ্নের সাক্ষাৎ প্রত্যুত্তর; তিনি ইচ্ছার সহিত অনুরাগের সহিত ঈশ্বরেতে আত্ম-সমর্পণ করেন, কোন প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া ওরূপ করেন না; তিনি স্পষ্ট রূপে জানিতে পান যে, জড় বস্তুর অধীনতাই পরাধীনতা এবং ঈশ্বরের অধীনতাই স্বাধীনতা;—কারণ, ঈশ্বর তাঁহার কেহ পর নহেন প্রত্যুত তিনি তাঁহার আত্মারও আত্মা। পূজ্য ব্যক্তির প্রতি এইরূপ নিষ্কাম অনুরাগকে ভক্তি কহা যায়। প্রজ্ঞা-অবিদ্যমানে যেমন সকলই স্বপ্নবৎ অর্থশূন্য ভাবে পরিণত হয়, ভক্তি অভাবে সেই রূপ সকলই শ্রী-হীন রূপে প্রতিভাত হয়। নিজে স্বপ্নবৎ হইলে সকলই স্বপ্নবৎ দেখায়, নিজে শ্রী-হীন হইলে সকলই শ্রী-হীন দেখায়;—সুতরাং আমরা যদি প্রজ্ঞা হইতে পারমা-

র্থিক সত্তা এবং ভক্তি হইতে পারমার্থিক শ্রী লইয়া আত্মসাৎ করিতে অবহেলা করি, তাহা হইলে আমরা নিজে অপদার্থ ও শ্রী-ভ্রষ্ট হইয়া সকলকেই যে সেই রূপ দেখিব ইহাতে আর বিচিত্রতা কি ?

আমাদের প্রজ্ঞা ও ভক্তি যখন পরমাত্মাতে সংযুক্ত হয়, তখন আত্মার সেই যে ক্রিয়া তাহা অত্যন্ত অন্তর্মুখীন হইয়া থাকে, হস্ত পদ পরিচালনার ন্যায়, বা বিষয় চিন্তার ন্যায়, বহির্মুখীন নহে। পূজার্হ মনুষ্য বিশেষকে আমরা যোড় করে মস্তক অবনত করিয়া প্রণাম করি, কিন্তু আত্মা মস্তকও নত করে না, করদ্বয়ও সম্মিলিত করে না, অথচ যার পর নাই *অকৃত্রিম ভক্তিভাবে পরমাত্মাকে* প্রণাম করিয়া থাকে ; আত্মার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য আমাদের শরীরও নত হয়, হস্তও কৃতাঞ্জলিপুটে আবদ্ধ হয়, নেত্রও সজল হয়, এ সকলই হয় বটে, কিন্তু এ সকল বিনা আয়াসে আপনা আপনি হয়, আত্মাকে এ সকল লইয়া ব্যস্ত হইতে হয় না ; কেন না আত্মা বিনা-নেত্রে পরমাত্মাকে দর্শন করি-

তেছে, বিনা-শ্রবণে তাঁহার আদেশ শুনিতেছে, বিনা-বাক্যে তাঁহার স্তুতি গান করিতেছে, বিনা-শরীরে তাঁহার চরণে প্রণিপাত করিতেছে, আত্মা কোন সহায় সম্পত্তি ও আড়ম্বর ব্যতিরেকেও পরমাত্মার সহবাসে নিমগ্ন হইয়া, পরম আনন্দে অভিষিক্ত হইয়া, অনন্ত জীবনের মত কৃতার্থ হইতেছে। পরমাত্মার সেই বিষয়াতীত অপরিমিত সৌন্দর্য্য, যাহা আমারদের আন্তরিক ভক্তিকে প্রগাঢ় রূপে চরিতার্থ করে, তাহার জ্যোতিতে যখন আমরা জগৎ সংসার নিরীক্ষণ করি, তখন আমাদের অন্তঃকরণে এক অনির্ব্বচনীয় প্রেমরস আবির্ভূত হয়;—সকলেই আমরা একই পরমেশ্বরের সৃষ্ট, সকলেই আমরা একই জগতে, একই রাজ্যে একই নিয়মের অধীনে বাস করিতেছি, সকলেই আমরা একই গৃহের অন্তর্ব্বর্ত্তী, কেহই পর নহে,—এই রূপ এক অনিবার্য্য প্রেমানল সমুদায় জগৎকে একাকার করিয়াও তাহাতে ক্ষান্ত হয় না;—কেন না পরমাত্মার প্রসাদ রূপ অক্ষয় ইন্ধনের সহিত তাহা

এমনি যুক্ত রহিয়াছে যে কিছুতেই তাহার আস্ফালনের পর্য্যাপ্তি হয় না। পরমাত্মা হইতে প্রাপ্ত তাঁহার প্রসাদ-চিহ্ন স্বরূপ—আমাদের আত্মাতে আমরা যতটুকু সৌন্দর্য্য ধারণ করি, তাহাই আমাদের নিকট—বাহিরের যাবতীয় পদার্থের সৌন্দর্য্য পরিমাপনের আদর্শ স্বরূপ হয়, এবং এই আদর্শকে আমরা যে পরিমাণে বাহিরে প্রয়োগ করিতে পারি, সেই পরিমাণে আমাদের প্রেম চরিতার্থ হয়। ঈশ্বরের সম্বন্ধে যখন আমরা জগৎকে নিরীক্ষণ করি, তখন তাহা ভক্তির দেবালয় তুল্য দিব্য শোভা ধারণ করে ; কিন্তু যখন উহাকে আমরা আমাদের নিজের সম্বন্ধে নিরীক্ষণ করি, তখন তাহা প্রেমের ক্রীড়া-কানন রূপে পরিণত হয় ; কেন না—জগৎকে যত আমরা আমাদের নিজের মনের মত করিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারি, ততই আমাদের প্রেম চরিতার্থ হয় ; কিন্তু সেরূপ করিতে গিয়া আমরা যখন দেখি যে জগতের সৌন্দর্য্য কেবল আমাদের নিজের মনোনুরূপ নহে—পরন্তু আর এক অচিন্ত্য প্রকার,

যখন দেখি যে আমাদের স্বল্প প্রেম তাহার নিকট পরাভব পাইয়া ফিরিয়া আইসে, যখন আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস হইতেছে যে ইহার মধ্যে এক অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য সংভুক্ত রহিয়াছে অথচ তাহা ধরিতে গিয়া আমাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইতেছে, তখন—সেই যে এক ভূমা ভাব তাহাতে আমাদের প্রেম আপাততঃ ক্ষুব্ধ হইলেও আমাদের ভক্তি তাহার দিকে প্রসারিত হইয়া অনুপম আনন্দ উপভোগে কৃতার্থ হইতে পারে।

প্রজ্ঞা হইতে এক পদবী নিম্নে বুদ্ধি, এবং তাহা হইতে আর এক পদবী নিম্নে ইন্দ্রিয়বোধ অবস্থিতি করে। বুদ্ধি কি? না আপনাকে জানিয়া বিষয় সকলকে জানা—সাধারণ জ্ঞান শক্তিকে বিশেষ বিশেষ জ্ঞানে পরিণত করা, ইহাকেই বুদ্ধি কহে। ইন্দ্রিয়বোধ কি? না, যে অন্ধশক্তি দ্বারা বিষয় আমাদের বুদ্ধি-বৃত্তি বা জ্ঞানশক্তিকে প্রতিরোধ করে, তাহাই ইন্দ্রিয় বোধ শব্দে আখ্যাত হয়। বুদ্ধি জ্ঞানবান্

আত্মা হইতে অজ্ঞান বিষয়ের দিকে, ইন্দ্রিয়-বোধ অজ্ঞান বিষয় হইতে জ্ঞানবান্ আত্মার দিকে, অভিমুখীন হয়;—ইন্দ্রিয়বোধ এবং বুদ্ধি, শরীর এবং আত্মা, পরস্পরের মধ্যে এই রূপ প্রতিদ্বন্দ্বিত্বা বর্ত্তমান রহিয়াছে।

আত্মজ্ঞান অনুসারে অন্যকে জানাতে যেমন বুদ্ধি প্রকাশ পায়, সেই রূপ আত্ম-ভাব অনুসারে অন্যের ভাব উপভোগ করাতে প্রীতি প্রকাশ পায়; কারণ, বাহি-রের সামগ্রী বিশেষে যত ক্ষণ না আমরা আ-মাদের মনের অনুরূপ কোন একটি আদর্শ আরোপ করিতে পারি, তত ক্ষণ আমরা তাহার সৌন্দর্য্য গ্রহণে বঞ্চিত থাকি। আমরা যখন একটা পুষ্প দর্শনে প্রীতি লা-ভ করি, তখন, আমাদের মনোমধ্যে যে এক সামঞ্জস্য ও পারিপাট্য ভাবের আদর্শ আ-ছে, তদনুসারে আমরা সেই পুষ্পের অবয়ব গুলিকে অগ্রে কল্পনা করি; পরে, সে-গুলিকে ঐ সাধারণ আদর্শের একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত রূপে অনুভব করিয়া, এই রূপে

আমাদের মনের ভাবকে বাহিরে মুর্ত্তিমান করিয়া, সৌন্দর্য্য সংভোগে রত হই। বিশেষতঃ মনুষ্যের শরীরে, মনুষ্যের কথা বার্ত্তাতে, মনুষ্যের ভাব ভঙ্গিতে, আমাদের নিজের মনের ঐ প্রকার অনেক গুলি আদর্শ আমরা সহজে ফলাইতে পারি বলিয়া, মনুষ্যকে আমরা যেমন প্রীতি করি, জগতের মধ্যে এমন আর কাহাকেও নহে।

ইন্দ্রিয়-বোধ উপলক্ষে পূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি যে, দেশে অবস্থান ও কালে পরিবর্ত্তন, অবস্থা ও পরিবর্ত্তন, এই দুয়ের মধ্যে ইন্দ্রিয়বোধ স্ফূর্ত্তি পায়। বুদ্ধি কি করে?—না, সেই অবস্থা পরিবর্ত্তনের মধ্যে কতকটা বহির্ব্বিষয়ের শক্তি এবং কতকটা আমাদের আপনাদের শক্তি উপলব্ধি করিয়া আত্মানাত্ম-জ্ঞানের কলিকা উন্মোচিত করে। মনে কর, আমরা একান্ত অনন্যমনা হইয়া কোন একটা গুরুতর বিষয় ভাবিতেছি, ইতি-মধ্যে সহসা একটা উন্মুক্ত লিপি আমাদের দৃষ্টি-ক্ষেত্রে নিপতিত হইল, ইহাতে আমাদের দর্শনেন্দ্রি-

য়ের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইল মাত্র, কিন্তু সে ঘটনার প্রতি আমাদের বুদ্ধির একটুকুও মনোযোগ হইল না ; সুতরাং সেই লিপি কিংবা তাহার অন্তর্গত লিখন-ছটা, কিংবা অক্ষরাবলির ভেদাভেদ, তখন ইহার কিছুই আমাদের জ্ঞান-গোচর হইল না। ইতি-পূর্ব্বে আমাদের দৃষ্টি হয় ত ধূসর বর্ণ মৃত্তি-কার উপরে নিহিত ছিল, এক্ষণে কৃষ্ণবর্ণ অক্ষরাবলি আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করিল। এই প্রকারে, অবস্থার পরিবর্ত্তন মাত্র ইন্দ্রিয়-বোধে প্রথমে সমানীত হয়, পরিশেষে বুদ্ধি আপন অন্তর-স্থিত আদর্শ অনুসারে তাহার অর্থ আবিষ্কার করিয়া তাহাকে জ্ঞানে পরিণত করে,—যেমন, শিক্ষিত আদর্শ অনুসারে আমরা ঐ লিপি-টির অক্ষর সকলের, পদ সকলের ও পরি-চ্ছেদ সকলের ভেদাভেদ নিরূপণ করিয়া, তবে আমরা তাহাকে জ্ঞানে আয়ত্ত করিতে সমর্থ হই।

আমাদের দেহাদির যেরূপ অবস্থা যে রূপ পরিবর্ত্তনের দিকে উন্মুখ থাকে,

সেইটি সংঘটিত হইলেই ইন্দ্রিয়-সুখ আবির্ভূত হয়;—যেমন, আমাদের প্রজ্বলিত জঠরানল যখন অন্ন ভোজনের দিকে উন্মুখ থাকে, তখন অন্ন ভোজন করিলেই আমরা সুখী হই। যে সুরের পর যে সুর, বা নিস্তব্ধতার পর যে সুর, শ্রবণে ভাল লাগে; যে বর্ণের পর যে বর্ণ, বা অন্ধকারের পর যে বর্ণ, নয়নে ভাল লাগে; যে রসের পর যে রস রসনাতে ভাল লাগে; সেই রূপে অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইলেই ইন্দ্রিয়-সুখ অনুভূত হইয়া থাকে। ভিতরে যে আমাদের প্রাণ-ক্রিয়া সকল চলিতেছে, তাহাও, যার পর যে-টি সেই ভাবে চলিলে, তবেই আমরা শারীরিক ভাল থাকি, তাহার ব্যাঘাত হইলেই রোগে আক্রান্ত হই। এই প্রকারে আমরা যখন ইন্দ্রিয়-সুখে সুখী হই, তখন তাহা আমাদের আপনার নিয়মে হই না, ভৌতিক নিয়মেই হইয়া থাকি;—বাহিরে কোথায় কি পরিবর্ত্তন হইতেছে, তদ্দ্বারা আমরা সুখে দুঃখে নিয়মিত হই। যত ক্ষণ না আমাদের অন্তরে প্রকৃষ্ট রূপে

জ্ঞানের উদ্রেক হয়, তত ক্ষণ অবস্থার পরিবর্ত্তনে আমরাও পরিবর্ত্তিত হইতে থাকি; —না আমাদের আপনার উপর, না সেই পরিবর্ত্তনের উপর, আমাদের কোন হস্ত থাকে। অবস্থা পরিবর্ত্তনের উপর নিয়ন্তৃত্ব করিয়া আমরা যে সুখ লাভ করি, সে এক প্রকার সুখ, এবং সেই পরিবর্ত্তনের দিকে হালি ছাড়িয়া দিয়া যে এক সুখ লাভ করি, সে এক প্রকার সুখ; পূর্ব্বোক্ত সুখ আমাদের সঙ্গের সঙ্গী, শেষোক্ত সুখ পথের সম্বল মাত্র—আনুষঙ্গিক উপকরণ মাত্র।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

মুল আদর্শ।

ইত্যগ্রে আমরা বলিয়াছি যে জ্ঞানের সহিত ভাবের যোগ রক্ষা করিয়া চলাই আমাদের সঙ্কল্প; এই হেতু পূর্ব্বকার মুল তত্ত্ব-সকল অবলম্বন করিয়াই মুল আদর্শ

সকলের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। প্রথমে, প্রজ্ঞা-ঘটিত মূল তত্ত্বসকলের সহিত আমাদের অন্তঃকরণের ভক্তি কি রূপ সায় দেয়, তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে।

প্রজ্ঞা হইতে আমরা এই পাইতেছি যে পরমাত্মা একমেবাদ্বিতীয়ং পূর্ণ ও মূলাধার, এবং জগৎ দ্বৈতময়, অপূর্ণ ও আশ্রিত। ঈশ্বরের সহিত যখন আমরা মুখ্যত আমারদের আত্মার যোগ হৃদয়ঙ্গম করি, তখন পাকত সমুদায় জগতের সঙ্গেও সেই যোগ প্রতীয়মান হইতে থাক। ঈশ্বর যেমন আমাকে জানিতেছেন, সেই রূপ তিনি সমুদায় জগৎকে জানিতেছেন। তাঁহার জ্ঞানের বিষয়—অনন্ত জগৎ, তাহার মধ্যে আমি কেবল এক জন মাত্র; সমুদায় জগৎকে জানিবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমাকে জানিতেছেন।

এই রূপে যখন পরমাত্মার সহিত আমাদের আত্মার এবং সমুদায় জগতের সম্বন্ধ অনুভুত হয়, তখন কি রূপ আদর্শ আমা-

দের ভাবে অভ্যুদিত হয়—তাহাই এক্ষণে অনুধাবন করিয়া দেখা যাইতেছে।

প্রথমতঃ—অন্তরে আমরা যত একের নিদর্শন পাই, আর বাহিরে যত অনেকের নিদর্শন পাই, এবং উভয়ের মধ্যে যত ঘনিষ্ট প্রেম-সম্বন্ধের নিদর্শন পাই; ততই আমাদের অন্তঃকরণ পরিতৃপ্ত হয়। ইহার বিপরীতে, অন্তরে একতা নাই, বাহিরে বিচিত্রতা নাই, এবং অন্তর বাহিরের মধ্যে কোন যোগ নাই,—এ রূপ নির্জীব ভাব দেখিলে আমাদের বড়ই বিরক্তি বোধ হয়। সূর্য্য, গ্রহ, উপগ্রহ—বহির্দৃষ্টি-সমক্ষে ইহারা কেমন অনির্ব্বচনীয় বিচিত্রতা প্রচার করিতেছে, কিন্তু অন্তর্দৃষ্টিতে দেখ, দেখিবে যে, উহারদের আকার অবয়ব গতিবিধি এবং আর আর তাবৎ ব্যাপার, একই সার্ব্ব-লৌকিক নিয়মে নিয়মিত হইতেছে। তরু, শাখা, প্রশাখা, বৃন্ত, পত্রের শিরা, উপশিরা—বহির্দৃষ্টিতে ইহা কেমন বিচিত্র ব্যাপার; কিন্তু অন্তর্দৃষ্টিতে সহজেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, উক্ত সমুদায় অবয়ব গুলি

একই আদর্শে বিরচিত। এই রূপ, হস্ত পদ ও শরীরের সমুদায় বিচিত্র অবয়ব সকলের মধ্যে, কাঙ্কালিক পণ্ডিতেরা এই এক প্রকার আশ্চর্য্য ঐক্যভাব অন্বেষণ করিয়া পাইয়াছেন যে, মেরুদণ্ডের অস্থিখণ্ড গুলির যেরূপ গঠন, সেই আদর্শ অনুসারে শরীরের আর সমুদায় অস্থি বিরচিত হইয়াছে। এই প্রকার আরও ভুরি ভুরি উদাহরণ উল্লেখ করা যাইতে পারে।

অতএব ভক্তির প্রথম মূল-আদর্শ এই যে, সকলের অন্তরতম পরমেশ্বর এক অদ্বিতীয় ভাবে মধ্যে বিরাজমান, চতুর্দ্দিকে জগৎ সংসার বহুধা বিচিত্র ভাবে বিরাজমান, এবং সকলের ভক্তি স্তুতি সেই এক অদ্বিতীয় পরমাত্মার দিকে বিনীতভাবে নিয়োজিত হইয়া—তাঁহার প্রেম-প্রবাহে জগতের শ্রী আর এক কল্যাণতর শোভায় দিন দিন পরিবর্ত্তিত হইতেছে। "মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বে দেবা উপাসতে।"

দ্বিতীয়তঃ—অন্তরে পূর্ণতা, বাহিরে অপূর্ণতা, এবং উভয়ের মধ্যে যত আমরা

ঘনিষ্ট যোগের সঞ্চার দেখিতে পাই, ততই আমাদের ভাব পরিতৃপ্ত হয়। ইহার বিপরীতে, অন্তরে সর্ব্বাঙ্গীন ভাব নাই, বাহিরে প্রভাবান্বিত আবির্ভাব নাই, এবং উভয়ের মধ্যে কোন প্রকার সম্বন্ধ নাই, ইহা ভাবের চক্ষে অতীব পীড়াজনক। বৃক্ষের অভ্যন্তরে কেমন একটি জীবনের ভাব আছে, এবং সেই জীবনের ভাব বাহিরে শাখা পত্র ফলফুলে কেমন আশ্চর্য্য রূপে পরিকীর্ণ হয়; বৃক্ষের সহিত জীবন-ভাবের এই রূপ সংযোগ থাকাতেই উহাতে আমরা একটি বিশেষ সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিয়া থাকি। কবির অন্তঃকরণ মধ্যে যে কোন একটি ভাব সর্ব্বাঙ্গীন রূপে অবস্থিতি করে, তাহারই ছায়াভাস বাহিরে কথঞ্চিৎ প্রকাশিত হইয়া এক খানি মনোহর কাব্যে পরিসমাপ্ত হয়। কিন্তু যদি এ রূপ হয় যে, কবির মনের ভাবটি সর্ব্বাঙ্গ-সমেত বাহিরে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা হইলে তাহাতে ইহাই সূচিত হয় যে, সে ভাব অতীব যৎসামান্য; কারণ, তাহা যদি তেমন গভীর

হইত, তবে কখনই তাহাকে অন্তর হইতে একেবারে উন্মূলিত করিয়া আনা সাধ্য হইত না। উত্তম কাব্য, উত্তম চিত্র-লেখা, উত্তম সঙ্গীত, ইহারদের এক আশ্চর্য্য রীতি; —ইহারদের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে এই রূপ এক ক্ষোভ নিঃশ্বসিত হইতে থাকে যে, মনের কথা মনেই রহিল—তাহা কেমনে বাহিরে প্রকাশ হইবে; নতুবা, "তাবৎই প্রকাশ করা হইয়াছে—কিছুই অবশিষ্ট নাই" ইহাতে সফরীর ঔদ্ধত্য ভিন্ন আর কিছুই প্রকাশ পায় না। এই রূপ দেখা যাইতেছে যে, ভিতরে ভাবের সংস্থান থাকা সৌন্দর্য্যের পক্ষে যেমন আবশ্যক, বাহিরে অভাবের আকিঞ্চন থাকা এবং উভয়ের মধ্যে সংযোগ থাকা, ইহাও তেমনি আবশ্যক। মনুষ্যের দেখ যে, পশুর তুলনায় তাহার অভাবের আয়তন কেমন সুবিস্তৃর্ত, তাহার আন্তরিক তৃপ্তিও সেই অনুসারে সুগভীর। পরমাত্মার গভীরতম ভাব আমাদের জীবাত্মাতে কখনই সর্ব্বাঙ্গ সমেত আবির্ভূত হইতে পারে না। তিনি যতই

কেন আমারদিগকে জ্ঞানে প্রেমে স্বাধীনতাতে পরিপূর্ণ করুন না, তথাপি তাঁহার সম্বন্ধে আমরা যে অপূর্ণ, সেই অপূর্ণই থাকিব; আমরা চিরকালই তাঁহার নিকট হইতে অধিকতর সহবাসানন্দ প্রার্থনা করিব, এবং চিরকালই তিনি আমারদের সেই প্রার্থনা পূরণ করিবেন,—তাঁহার সহিত আমারদের এই রূপ নিত্য সম্বন্ধ। অতএব ভক্তির দ্বিতীয় আদর্শ এই যে, সকলের অভ্যন্তরে পরমেশ্বর পূর্ণ ভাবে বিরাজ করিতেছেন, জগৎ অপূর্ণ ভাবে বিরাজ করিতেছে, এবং ভক্তি-যোগে তাঁহার প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার প্রসাদে সকলেই দিন দিন অধিকাধিক আধ্যাত্মিক শান্তি উপভোগে কৃতার্থ হইতেছে।

তৃতীয়তঃ;—অন্তরে স্বাধীনতা, বাহিরে পরাধীনতা, এবং উভয়ের মধ্যে যত ঘনিষ্ঠ যোগ দেখিতে পাওয়া যায়, ততই আমাদের ভাব পরিতৃপ্ত হয়। ইহার বিপরীতে, অন্তরে স্বাধীনতা নাই, বাহিরে নিয়ম-বদ্ধতা নাই, এবং উভয়ের মধ্যে কোন সম্বন্ধ নাই,

ইহা তাঁবের চক্ষে অতীব নিন্দনীয়। আমরা ঈশ্বরের নিয়মাধীন হইয়া আপনার নিয়মে বর্ত্তিয়া আছি—এইটি আমাদের ভিতরের ভাব; নানা বিষয়ের অনুরোধে নানা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছি—এইটি আমাদের বাহিরের ভাব, এবং বাহিরের নানা নিয়ম-সংকুল পরাধীনতাক্ষেত্রে আমাদের অন্তরের স্বাধীনতা অধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত হইয়া, সেখানেও উহা স্বধর্ম্ম অনুষ্ঠান পূর্ব্বক মঙ্গল উৎপাদনে কৃতকার্য্য হইতেছে—এইটি উভয়ের মধ্যবর্ত্তী ঘনিষ্ট সম্বন্ধ-সূত্রের পরিচয় দিতেছে। এই রূপে আমাদের অন্তরের স্বাধীনতাকে আমরা যে পরিমাণে কর্ম্ম-ক্ষেত্রে, বলবৎ করিতে পারি, সেই পরিমাণে আমরা ঈশ্বরের সৃষ্টিস্থিতি-কর্ত্তৃত্ব বিষয়ের আভাস পাইয়া কৃতার্থ হইতে পারি। অতএব ভক্তির তৃতীয় আদর্শ এই যে, পরমাত্মা একান্ত স্বাধীন রূপে সকলের অভ্যন্তরে বিরাজ করিতেছেন, জগৎ কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলায় পরিবদ্ধ হইয়া বাহিরে বিরাজ করিতেছে, এবং সকলে ভক্তি সহকারে

তাঁহার কার্য্যে উদ্যোগী হইয়া স্বাধীনতা লাভে দিন দিন কৃতকৃত্য হইতেছে।

এই যে কএকটি মূল আদর্শের সন্ধান পাওয়া গেল, সকলের মধ্যে সার কথা— ঈশ্বরের ভজনা, কি না ভক্তি পূর্ব্বক ঈশ্বরের উপাসনা। ঈশ্বরের প্রতি যখন আমাদের আত্মা তদ্গত-ভাবে আকৃষ্ট হয়, তখন তাঁহার সমীপে আমরা গণনার অযোগ্য, অকিঞ্চন এবং একান্ত আশ্রিত—এই রূপ ভাব আমাদের মনো-মধ্যে কাজেই প্রবল হয়; এবং সেই সঙ্গে আমরা ঈশ্বরকে সমুদায় জগতের স্রষ্টা পাতা রূপে অনুভব করিতে সমর্থ হই,—তখনই আমরা ইহা জানিয়া কৃতার্থ হই যে, যিনি পূর্ণজ্ঞান, পূর্ণশক্তি, পূর্ণমঙ্গল, তিনিই সমুদায় জগতের স্রষ্টা পাতা। ঈশ্বরের উপাসনা, রোগ শোক পাপ তাপ, সকলেরই মহৌষধ; ঈশ্বরের উপাসনাই আমারদের শান্তি-নিকেতন। যদি রোগ হইয়া থাকে, সেখানে যাও, আরোগ্য পাইবে; শোক হইয়া থাকে, সেখানে যাও, সান্ত্বনা পাইবে; ভয় হইয়া

থাকে, সেখানে যাও, অভয় পাইবে ; পাপ হইয়া থাকে, সেখানে যাও, ক্ষমা পাইবে ; রোগ শোক ভয় পাপ, সেখানে ইহার কিছুই রহিবে না, সকল দুঃখই চলিয়া যাইবে। ঈশ্বরের উপাসনা, পরম পিতা পরম মাতা ও পরম বন্ধুর উপাসনা—অজ্ঞাত অপরিচিত উদাসীনের উপাসনা নহে। অতএব ইহা কি না সৌভাগ্যের বিষয় যে এমন ঈশ্বরোপাসনায় সকলেই আমরা অধিকারী।

তৃতীয় অধ্যায়।

মূল আদর্শ।

ঈশ্বরের সহিত আত্মার সম্বন্ধ-মুলক যে সকল সৌন্দর্য্যের আদর্শ আমাদের অন্তঃকরণে প্রকাশ পায়, তাহা এক প্রকার নির্ণীত হইল; এক্ষণে, আত্মায় আত্মায় যে রূপ প্রেম সম্বন্ধ, তাহারই আদর্শ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

পূর্ব্বকার প্রতিজ্ঞাত প্রণালী অনুসারে চলিতে হইলে, বর্ত্তমান স্থলে বুদ্ধির মূল তত্ত্ব

গুলির প্রতি সর্ব্বাগ্রে মনোনিবেশ করা আবশ্যক।

বুদ্ধির মূল-তত্ত্ব কি? না আত্মা এক, ভাবাত্মক ও স্বাধীন; বিষয় অনেক, অভা-বাত্মক ও পরাধীন; জ্ঞান সমষ্টি-বদ্ধ, সীমা-বদ্ধ ও পরস্পরাধীন।

প্রজ্ঞার মূল-তত্ত্ব এবং বুদ্ধির মূল-তত্ত্ব উভয়ের মধ্যে কি বাস্তবিকই প্রভেদ আছে? না কেবল একটা প্রভেদ কল্পিত হইয়াছে? এই একটি আপত্তি এখনো আমাদের গতি রোধ করিতে ক্ষান্ত হইতেছে না। সংক্ষেপতঃ, প্রজ্ঞার অদ্বিতীয়ত্ব এবং বুদ্ধির একত্ব, এ দুয়ের মধ্যে প্রভেদ আছে কি না প্রণিধান করিয়া দেখিলেই জিজ্ঞাস্য বিষ-য়ের যথোচিত মীমাংসা হইতে পারিবে।

মনে কর, আমার এক খণ্ড ভূমি মাপি-বার প্রয়োজন হইয়াছে; তজ্জন্য এক হস্তই হউক, এক কাঠাই হউক, এক বিঘাই হউক, কতক পরিমাণ স্থানকে এক বলিয়া ধার্য্য করা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। এক হস্তকে এক গণ্য করিলে আমার পক্ষে হয়-ত সুবিধা

হয়, এক কাঠাকে এক গণ্য করিলে অন্যের পক্ষে হয়-ত সুবিধা হয়,—কেন না বুদ্ধি বৃত্তির ধারণ-শক্তি কাহারো বা অধিক কাহারো বা অল্প, কাহারো বা গ্রহ চন্দ্রাদির মধ্যগত ব্যবধান মাপা অভ্যাস, কাহারো বা ক্ষেত্রাদি মাপা অভ্যাস, সুতরাং যে পরিমাণ দণ্ড আমার মনোবৃত্তির ধারণোপযোগী, অন্যের পক্ষে তাহা সেরূপ না হইয়া ন্যূনাতিরেক হইতে পারে। অতএব খণ্ড আকাশ বিশেষকে আমরা চাই এক বলি, অন্যে চাই দুই বলুন, যাহার যে রূপ ধারণ-শক্তি তিনি সেই অনুসারে গণনা করুন, তাহাতে কিছুমাত্র বাধা নাই। কিন্তু কাহারো সাধ্য নাই যে, তিনি অসীম আকাশকে এক ভিন্ন দুই বলিতে পারেন। অসীম আকাশ সম্বন্ধে আমার ধারণ-শক্তি যে রূপ, অন্যেরও সেই রূপ সমূলে ব্যর্থ হয়। খণ্ড আকাশের একত্ব আমাদের নিজের নিজের তারতম্য-বিশিষ্ট ধারণ-শক্তিকে অপেক্ষা করে, অতএব ইহা অপেক্ষিক; কিন্তু অসীম আকাশের যে একত্ব তাহা নিরপেক্ষ সুতরাং

নির্ব্বিকল্প। অসীম আকাশ যদিও আমাদের ধারণ-শক্তির অতীত, তথাপি তাহার সেই অদ্বিতীয় একত্ব মূলে অপ্রতিহত থাকাতেই খণ্ড আকাশ সকলের সদ্বিতীয় একত্ব সিদ্ধ হইতে পারিতেছে। পূর্ব্ব হইতেই প্রজ্ঞাতে অসীমের ভাব বিদ্যমান রহিয়াছে, বুদ্ধি সেখানে পৌঁছিতে পারে না। বুদ্ধি যদি অসীমের দিকে হস্ত প্রসারণ করে, তবে সে কেবল হাস্যাস্পদ হয়, ইহাই সত্য। আমারদের স্ব স্ব পরীক্ষিত বিষয় সমূহের মধ্যে বুদ্ধি যে কোন একত্ব উপলব্ধি করে, তাহাতে জীবাত্মার পরিমিত একত্বেরই পরিচয় দেওয়া হয়; কিন্তু সকল একত্বের মূল একত্ব যাহা পূর্ব্ব হইতে আমাদের প্রজ্ঞাতে স্থির-নিশ্চয় রহিয়াছে, তাহাতে পরমাত্মার অদ্বিতীয় একত্ব প্রতিপন্ন হয়। অতঃপর প্রকৃত প্রস্তাবে প্রত্যাবর্ত্তন করা যাইতেছে।

আমাদের স্ব স্ব জীবাত্মার একত্ব, ভাবাত্মকতা, স্বাধীনতা, তদীয় বিষয়ের অনেকত্ব, অভাবাত্মকতা, পরাধীনতা, এবং উভয়ের

মধ্যগত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, এই আদর্শানুযায়ী যে-কোন দৃশ্য আমাদের সম্মুখে আইসে, তাহাতেই আমাদের প্রেম আকৃষ্ট হয়। কেন না, সকল হইতে মুখ্যতম রূপে আমরা আপনা আপনাকে প্রীতি করিয়া থাকি, এবং আমাদের নিজের ভাব আমরা অন্যেতে যে পরিমাণে মূর্ত্তিমান্ দেখি সেই পরিমাণে তাহার প্রতি আমাদের প্রীতি বর্ত্তে।

প্রথমতঃ;—আমরা আপনারা যে পরিমাণে বিচিত্র বিষয় সকলকে একের অন্তর্গত করিয়া ধারণ করিতে পারি, অন্যেতে তদনুরূপ ভাব দেখিলে তাহাকে আমরা আপনার মত করিয়া হৃদয়ে স্থান দিই। এতদ্ভিন্ন, যাঁহার ধারণ-শক্তির ইয়ত্তা আমাদের অপেক্ষা অধিক, অর্থাৎ যিনি আমাদের অপেক্ষা বহুদর্শী ও দূরদর্শী, তাঁহাকে আমরা ভক্তি করি; এবং যাঁহার ধারণ-শক্তির ইয়ত্তা আমাদের অপেক্ষা অল্প, তাঁহাকে আমরা স্নেহ করি। বিদ্যা অর্থ, মান সম্ভ্রম, আচার ব্যবহার, ভাব ভক্তি, কোন না কোন বিষয়ে

দুই জনের ইয়ত্তা-পরিধি পরস্পর-সন্নিধানে সমান বলিয়া পরিচিত হইলেই উভয়ের মধ্যে প্রীতির সঞ্চার হইতে পারে। অপিচ, দুই জনের মধ্যে বাহিরে বিস্তর অনৈক্য থাকিলেও ভিতরে ঐক্য থাকিবার কিছুমাত্র বাধা নাই। এক জন হয়ত বণিক্, অন্য জন হয়ত কৃষক, অথচ দুই জনেরই অর্থের প্রতি সমান রূপ মমতা থাকিতে পারে। এক জন হয়ত স্ত্রী, অন্য জন হয়ত পুরুষ, অথচ তাহাদের মধ্যে পতি-পত্নী সম্বন্ধ থাকিলে—গৃহকার্য্য সুনির্ব্বাহ, সন্তান প্রতিপালন, এ-সকল বিষয়ে উভয়েরই সমান রূপ যত্ন থাকিতে পারে। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যে রূপ সম্বন্ধ, তাহাতে বলা যাইতে পারে যে, তাহারা বাহিরে দুই কিন্তু ভিতরে এক; নতুবা কি, স্ত্রী পুরুষের পরস্পর অবস্থা-বৈচিত্র্য গুণে—উদ্বাহ-বন্ধন-জনিত উহাদের ভিতরের একত্ব বিলুপ্ত হইতে পারে? কখনই না, তাহা আরো উজ্জ্বল রূপে প্রকটীকৃত হয়;—রজনীর অন্ধকারে তারকাবলি যেমন ঢাকা পড়ে না, প্রত্যুত তাহাদের

উজ্জ্বলতা আরো ফুটিয়া বাহির হয়;—সেই রূপ।

দ্বিতীয়তঃ;—আমরা আপনারা যে পরিমাণে অভাবান্বিত আবির্ভাব সকলের মধ্যে ভাবের আস্বাদ পাই, অন্যোতে সেই-মাত্রায় ভাবুকতার নিদর্শন পাইলে তাহার প্রতি আমারদের প্রীতি সংক্রামিত হয়। এতদ্ভিন্ন, যিনি আমাদের অপেক্ষা অধিক-মাত্রায় ভাবুক, তিনি আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র, যিনি তদপেক্ষা অল্প-মাত্রায় ভাবুক, তিনি আমাদের স্নেহের পাত্র। এই জন্য, প্রীতির শিকড় সমবয়স্কদিগের মধ্যে যেমন সহজে বিস্তারিত হইতে দেখা যায়, বিভিন্নবয়স্কদিগের মধ্যে সে রূপ কখনই সম্ভবে না।

তৃতীয়তঃ;—আমরা আপনারা যে পরিমাণে পরাধীনতার মধ্যে স্বাধীনতা উপভোগ করি, তদনুরূপ ভাব অন্যেতে দেখিলে তাহার প্রতি আমাদের প্রীতি নিবদ্ধ হয়; এবং সে ভাবের ন্যূনাতিরেক দেখিলে তৎপরিবর্ত্তে স্নেহ-ভক্তির উদ্দীপন হয়। এই প্রকার সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায় যে, উচ্চের প্রতি

শ্রদ্ধা ভক্তি, সমানে সমানে প্রেম, এবং নীচের প্রতি স্নেহ মমতা, ভাবের স্রোত এই রূপ ত্রিপথ-গামী।

এত ক্ষণ যাহা বলা হইল, তাহার মধ্য হইতে সার সংকলন করিলে এবং তদীয় আনুষঙ্গিক দুই একটি শাখা প্রশাখা বর্দ্ধিত করিলে, নিম্নলিখিত কতিপয় সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়; যথা—

প্রথমতঃ; প্রকৃত প্রেম যাহা, তাহা পৃথিবী লোকে মনুষ্যে মনুষ্যেই সম্ভবে। বৃক্ষলতা, পশু-পক্ষী, ইহারা আমাদের ক্রীড়ার বস্তু হইতে পারে, প্রেমের বস্তু হইতে পারে না। মনুষ্যে মনুষ্যে প্রেম বলাতে আত্মায় আত্মায় প্রেম বুঝায়—এই প্রেমই যথার্থ প্রেম নামের যোগ্য। আত্মায় আত্মায় যে কেমন প্রেম, তাহা আমরা স্ব স্ব অন্তরেই উপভোগ করিতে পারি; যে,হেতু, সকলেই আমরা আপনা আপনাকে প্রীতি করিয়া থাকি। আপনাকে প্রীতি করা আত্মারই ধর্ম্ম; এই হেতু আমাদের আত্মা যত উন্নত হয়, ততই আমরা অধিক পরিমাণে

আপনাকে প্রীতি করিতে সমর্থ হই ;—যে পরিমাণে আমরা ঈশ্বরের ভক্ত, সেই পরিমাণে আমাদের আত্মা উন্নত, সেই পরিমাণে আমরা আপনাতে এবং অন্যেতে প্রীতি রসাস্বাদনে পরিতৃপ্ত হই।

দ্বিতীয়তঃ,—আমরা আপনার ভাব অনুসারেই অন্যের সহিত প্রেমে আবদ্ধ হইয়া থাকি। এক জন বিদ্যার্থী পণ্ডিত, এবং এক জন ধনার্থী বণিক্, উভয়ের মধ্যে প্রীতির সঞ্চার হইতে না পারে এমন নয় ; কিন্তু তাহা হইলে ইহা অবশ্যই মানিতে হইবে যে, বিদ্যা ও অর্থ ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে উভয়ের মধ্যে যথোচিত ঐক্য আছে, নতুবা কিসের উপরে স্থাপিত হইয়া উহাদের পরস্পরের মধ্যে প্রেম সজীব থাকিবে। এক বার কোন বিষয়ে দুই জনের মধ্যে প্রেমের সূত্রপাত হইলে, পরে যত তাহাদের মধ্যে সে বিষয়ের আলোচনা হয়, এবং তজ্জন্য উভয়ই সে বিষয়ে একত্র উন্নতি লাভ করে, ততই তাহাদের মধ্যে প্রেম-সম্বন্ধের ঘনিষ্ঠতা হয় ; এবং উভয়ের যদি

ঈশ্বরের প্রতি লক্ষ্য থাকে, তাহা হইলে তাহাদের সে প্রেম কোন কালেই জরাগ্রস্ত হইয়া মৃত হয় না, প্রত্যুত ক্রমশই বিকশিত হইয়া আনন্দামৃতে পূর্ণ হইতে থাকে।

তৃতীয়তঃ;—উচ্চতর ব্যক্তির সহবাসে আমাদের শ্রদ্ধা ভক্তি চরিতার্থ হয়, এবং তাহাতে আমরা উন্নতির দিকে আকৃষ্ট হই। কখন কখন এরূপ হয় যে, অরোগী হৃষ্ট পুষ্ট বলবান্ চিকিৎসক বিশেষ অভ্যাগত হইবামাত্র রোগীর রোগ দূরে পলায়ন করে;—ভক্তি শ্রদ্ধাই এরূপ আরোগ্যের মূল। রোগী ব্যক্তি যেমন চিকিৎসকের হস্তে আপনাকে শ্রদ্ধার সহিত সমর্পণ করে, সেই রূপ আমরা যদি ঈশ্বরের উপরে সম্পূর্ণ ভরসা স্থাপন করত সাংসারিক দুঃখ বিপদে ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকি এবং তাঁহার আদিষ্ট সদুপায়ে তৎপর হই, তাহা হইলে তিনিই আমারদের আত্মার উন্নতি করিয়া দেন; কিন্তু দুর্দ্দান্ত রোগীর ন্যায় আমরা যদি অধৈর্য্য হইয়া ঈশ্বরের সাহায্য বিনা আপনার বুদ্ধির উপর নির্ভর করিতে

যাই, তাহা হইলে আমরা পদে পদে আরো রোগ সঞ্চয় করিতে থাকি।

সমানের সহবাসে প্রীতি চরিতার্থ হয়, এবং তাহাতে বর্ত্তমান অবস্থার মধ্যেই আমাদের সন্তোষ নিমগ্ন থাকে। ভক্তি উন্নতির দিকে চক্ষু নিবিষ্ট করিয়া থাকে, প্রীতি বর্ত্তমান অবস্থার মধ্যে দ্রব্যাদি গুছাইয়া সন্তোষ উপভোগে রত হয়; পরন্তু এ প্রীতির যদি ভক্তির সহিত সংস্রব না থাকে, তাহা হইলে সে সন্তোষ দেবতার বর্ষণ অভাবে ক্রমে ক্রমে শুষ্ক হইয়া যায়; কেন না ঈশ্বরের কল্যাণ আশীর্ব্বাদ আমাদের শরীর মন আত্মাতে যথাপরিমাণে বর্ষিত না হইলে, আপন আত্মাও আমাদের নিকটে অসার ও হেয় বোধ হয়, তবে আর কে আমাদিগকে প্রীতি দানে পরিতুষ্ট করিবে? সম্পূর্ণ দাতার নিকটে সম্পূর্ণ গৃহীতার যে রূপ ভাব হওয়া উচিত, সেই রূপ ভক্তি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার ভাব আত্মাকে অভিভূত করিলে, তবেই ঈশ্বরের দান আমারদের

নিকটে বিশেষ রূপে স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে। ইন্দ্রিয়ের বলে আমরা বিষয় উপভোগ করি, সমুদায় আত্মার বলে আমরা আপনাকে প্রীতি করি, কিন্তু সমুদায় আত্মার বলেও আমরা পরমাত্মাকে ভক্তি করিয়া উঠিতে পারি না ; তবে কি? না তাঁহার সাহায্যে বিশ্বাস পূর্ব্বক যে পরিমাণে আমরা তাঁহাতে ভক্তি সমর্পণ করি, সেই পরিমাণেই আমারদের আত্মায় আত্মায় বিশুদ্ধ প্রীতির সঞ্চার হইতে থাকে।

সর্ব্বশেষে বক্তব্য এই যে, যদিচ মুখ্য রূপে ধরিতে গেলে মনুষ্যই কেবল আমাদের প্রীতির আস্পদ হইতে পারে, তথাপি বহির্ব্বিষয় সকলেতে মনুষ্যত্বের ভাব কৃত্রিম রূপে আরোপ করিতে পারা যায় বলিয়া উহাদিগকেও আমরা এক প্রকার প্রীতি করিতে পারি। সূর্য্যকে আমরা বলি চক্ষুষ্মান্, আলোককে—আনন্দযুক্ত, রজনীকে—প্রশান্ত ; কিন্তু বাস্তবিক, সূর্য্যেতে চক্ষু নাই, আলোকে আনন্দ নাই, রজনীতে শান্তি নাই,—সকলই আমাদের

মনে। অন্ধকার আমাদের সম্মুখ হইতে বিষয়-সকল কাড়িয়া লয়, আলোক পুনর্ব্বার তাহাদিগকে আমাদের নিকট প্রত্যানয়ন করিয়া আমাদের মনে আনন্দ বিধান করে —এই পর্য্যন্ত; কিন্তু সে আনন্দ আমাদের মনেরই সম্পত্তি, আলোকের তাহাতে স্বত্ব নাই। অতএব আলোককে কেবল আমরা কৃত্রিম রূপেই আনন্দনিধান বলিয়া সম্বোধন করিতে পারি;—শিশুকে যেমন নানা রূপ উচ্চপদসেব্য উপাধিতে সম্বোধন করিয়া আদর করা যায়—সেই রূপ। প্রকৃতিকে ঈশ্বরপদোচিত উপাধি দিয়া ব্যাখ্যা করাও এই রূপ অবাস্তবিক স্নেহ-সম্ভাষণ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

অতএব আমরা আত্মাকে যে ভাবে প্রীতি করি, বিষয়কে কদাপি সে ভাবে প্রীতি করিতে পারি না। কেন না ইহা সুস্পষ্ট যে, যদি একটা কোন সামগ্রীতে রত হওয়া কর্ত্তব্য হয়, তবে তাহা বিষয় নহে, কিন্তু আত্মা; এবং যদি হেলাক্রমে নানাবিধ বিচিত্র সামগ্রীতে বিচরণ করা কর্ত্তব্য হয়,

তবে তাহা আত্মা নহে কিন্তু বিষয়-সঙ্গ। সুতরাং গাঢ় প্রেমাসক্তি আত্মার সঙ্গেই বিধেয়, বিচিত্র বিষয়ের সঙ্গে তরল বাল্য-ক্রীড়াই বিধেয়, এ ভিন্ন বিষয়-বিশেষের সহিত অকাট্য গ্রন্থিতে অনুস্যূত হওয়া কদাপি বিধেয় নহে।

চতুর্থ অধ্যায়।

মূল আদর্শ।

প্রেমের আদর্শের পর ইন্দ্রিয়-সুখের আদর্শ অন্বেষণ করা যাইতেছে। কিন্তু অগ্রে আবশ্যক, যে বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়-বোধ উভয়ের মধ্যে ভেদাভেদ কি রূপ, তাহার প্রতি এক বার দৃষ্টিপাত করা। বুদ্ধির কার্য্য—সাধারণ ও বিশেষ উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ সংস্থাপন করা, ইন্দ্রিয়-বোধের কার্য্য—সে সম্বন্ধের প্রতি উদাসীন থাকিয়া বিচ্ছিন্ন বিষয়েতে অভিলিপ্ত হওয়া। সাধারণ পশু-ভাবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া যখন আমরা কোন একটা বিশেষ পশুর প্রতি—যথা হরিণের

প্রতি—মনোযোগ করি, তখন সেই হরিণের সহিত আর আর পশুর সহিত সম্বন্ধ বিষয়ে আমাদের মনে আলোচনা হইতে থাকে, এবং সঙ্গে সঙ্গে এই তিনটি তত্ত্ব মূলে স্ফূর্ত্তি পায় যে, সাধারণ পশু—এক, বিশেষ পশু—অনেক, এবং এই অনেক পশুর মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ রহিয়াছে। কিন্তু পশু-ভাব কি কোন ভাবের প্রতি আমাদের লক্ষ্য নাই, ইতি-মধ্যে একটা হরিণ যদি আমাদের দৃক্-পথে উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সেই হরিণের সহিত আর আর পশু প্রভৃতির ভেদাভেদ কিছুই আর মনে হয় না, কেবল আমাদের দৃষ্টি উহাতে বিলীন হইয়া একটা অবস্থা পরিবর্ত্তন মাত্র যাহা কিছু অনুভূত হয়।

বুদ্ধির ক্রিয়া ও বুদ্ধির লক্ষ্য দুয়ের মধ্যে যেমন একটি প্রভেদ উপলব্ধি হয়,—ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া ও ইন্দ্রিয়ের লক্ষ্য এ দুয়ের মধ্যে সে রূপ হয় না। "এই যাহা দেখিতেছি এটা হরিণ; কি রূপে জানিলাম? না শাখায়মান শৃঙ্গ, দ্বিখণ্ডিত খুর, কোমল অঙ্গ ইত্যাদি লক্ষণ-সকল দ্বারা।"

বুদ্ধির লক্ষ্য এস্থলে প্রত্যক্ষ হরিণ, বুদ্ধির ক্রিয়া এ স্থলে—শৃঙ্গাদি অবয়বগুলির বিবেচনা দ্বারা হরিণত্ব সিদ্ধি করা; সুতরাং উভয়ের মধ্যে অনায়াসেই ভেদ নির্দিষ্ট হইতে পারে। কিন্তু ইন্দ্রিয়-বোধ উপলক্ষে কদাপি এরূপ বলিতে পারা যায় না যে. শ্রবণ-ক্রিয়া এইটি—এবং তাহার লক্ষ্য ধ্বনি এইটি, ঘ্রাণ-ক্রিয়া এইটি এবং তাহার লক্ষ্য গন্ধ এইটি, ইত্যাদি,—ইন্দ্রিয়-ক্রিয়া এবং ইন্দ্রিয়ের লক্ষ্য, দুইকে কদাপি পৃথক্ পৃথক্ রূপে ধরিতে পারা যায় না।

ঐক্যানৈক্য প্রভৃতি বিবেচনা যাহা বুদ্ধির প্রাণ-স্বরূপ, ইন্দ্রিয়-বোধ তাহার বিরোধী। অবিবেচনাই ইন্দ্রিয়-বোধের উপজীবিকা। যেখানে বিবেচনার প্রাদুর্ভাব সেখানে ইন্দ্রিয়-বোধ শাসনে থাকে, যেখানে ইন্দ্রিয়-বোধের প্রাদুর্ভাব সেখানে বিবেচনা কারা-বদ্ধ থাকে। আমাদের শরীরের কোন অঙ্গ যখন আঘাত পাইয়া ব্যথিত হইয়াছে, তখন যদি আমাদের এ রূপ বিবেচনার অবকাশ হয় যে, আমি স্বতন্ত্র ও আমার শরীর স্বতন্ত্র, তাহা

হইলে সে ব্যথার তখনি অস্ত হয়; কিন্তু কঠোর পরীক্ষাতে ইহাই দেখা গিয়া থাকে যে, ইন্দ্রিয়-বোধ ও-রূপ প্রবল হইয়াছে কি—অমনি আমাদের আত্মানাত্ম-বিবেচনা খর্ব্ব হইয়া যায়।

যখন এ রূপ হয় যে, আমরা আমাদের জ্ঞানকে যথেচ্ছাক্রমে নানা বিষয়ে নিয়োগ করিতে পারিতেছি, তখন সেই জ্ঞান-কার্য্যে আমাদের আত্মারই শক্তি প্রকাশ পায়; কিন্তু যখন দেখি যে আমরা অবস্থার দাস হইয়া সে রূপ করিতে পারিতেছি না, তখন আমাদের সেই অশক্তিতে বিষয়েরই শক্তি প্রকাশ পায়।

যত ক্ষণ আমরা বিষয় হইতে নির্লিপ্ত থাকি, তত ক্ষণই বিষয় আমাদের কর্ত্তৃক গ্রাহ্য হইতে পারে; কিন্তু আমরা যদি বিষয়ের সহিত এরূপ লিপ্ত হইয়া যাই যে, আপনাতে তাহাতে কিছুই প্রভেদ দেখিতে পাই না, তাহা হইলে উহা আমারদের জ্ঞানের অবিষয় হইয়া পড়ে।

নিদ্রাকর্ষণ-বশে যখন আমাদের চেতন

অবসন্ন হইয়া পড়ে, যখন আমাদের অন্তঃ-করণ শরীরসাৎ হইয়া প্রসুপ্তিরূপ এক অবস্থা বোধ মাত্রে পর্য্যবসিত হয়, তখন শরীরাদিকে আর বিষয় বলিয়া বোধ থাকে না। ইন্দ্রিয়-বোধ এই নিদ্রাবস্থারই প্রতি-কৃতি। নিদ্রা যেমন এক অবস্থা মাত্র, ইন্দ্রিয়-বোধও সেই রূপ এক অবস্থা মাত্র;—ফলতঃ আমাদের জ্ঞান যেমন অবস্থাপ্রবাহের মূল-স্থিত দর্পণ স্বরূপ, ইন্দ্রিয়-বোধ সে রূপ নহে।

প্রেম ও ইন্দ্রিয়-সুখ দুয়ের মধ্যে প্রভেদ দেখিতে হইলে, এক দিকে গীত-রচয়িতা, চিত্রকর, কবি, এবং এক দিকে সুখাসক্ত বিলাসী, দুয়ের ইতর বিশেষের প্রতি লক্ষ্য করিলেই তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারা যাইবে। কবি এক জন আপন রচনার ভাবটির প্রতি যেমন অনুরক্ত, তাহার শব্দ-লালিত্যের প্রতি তেমন নহে; কিন্তু বিলাসী এক জন সেই রচনার শব্দ-মাধুরী মাত্রে এরূপ বাঝা পড়িয়া থাকেন যে, তাহার মর্ম্মে প্রবেশ করিতে তাঁহার আর অবকাশ

হয় না। কবির দৃষ্টান্তানুযায়ী মনের ভাব অ-নুসারে বাহিরের সামগ্রী-সকলকে অধিকার করা—প্রেমের পদ্ধতি; এবং বিলাসীর দৃষ্টা-ন্তানুযায়ী অজ্ঞাতসারে বাহিরের সামগ্রী-সকল কর্ত্তৃক মনকে অধিকার করা—ইন্দ্রিয় সুখের পদ্ধতি। এখানে এই যেমন দুইটি ভাব দেখা গেল—কবির মনের ভাব এবং বিলাসীর মনের ভাব; এই রূপ প্রতি মনু-ষ্যের মনোমধ্যে দুই প্রকার ভাবের নিদর্শন পাওয়া যায়;—কি? না প্রবৃত্ত ভাব আর প্রবর্ত্তক ভাব, স্বপ্ন ভাব ও জাগ্রৎ ভাব, তাচ্ছল্যের ভাব ও ব্যবস্থার ভাব, ইত্যাদি; প্রথমটি প্রাকৃতিক ভাব, দ্বিতী-য়টি আধ্যাত্মিক ভাব, প্রথমটি পশু-ভাব, দ্বিতীয়টি মনুষ্য-ভাব। দেশ কালে কেবল প্রবৃত্ত ভাবই দৃষ্টি-গোচর হইতে পারে, কিন্তু প্রবর্ত্তক ভাব আত্মা ভিন্ন আর কোথাও অন্বেষণ করিয়া পাওয়া যায় না। আত্মা যাহা আদেশ করে, কাল তাহাই মস্তকে বহন করে। আমরা যদি একটা গোলাকে দ্রুত-বেগে চালনা করি, তবে

কোন প্রতিবন্ধক অবিদ্যমানে কাল ক্রমা গত তাহাই করিবে; আমরা যদি গোলা-টাকে মন্দ-বেগে চালনা করি, কালও তাহাই ক্রমাগত করিতে থাকিবে। কালেতে নূতন কিছুই হয় না; আত্মা কর্ত্তৃক যাহা আরব্ধ হয়, কালেতে তাহাই কেবল বহমান হয়। নূতন আরম্ভ—আত্মা ভিন্ন আর কাহারো কর্ত্তৃক সংঘটনীয় নহে, পুরাতন অভ্যাসই কেবল কালের অধিকারে স্থান পায়। কিন্তু আত্মার প্রারব্ধ কার্য্য-সকলকে কাল যে এই রূপ যথাজ্ঞাক্রমে বহন করে, তাহাও আত্মার মূলবর্ত্তিতা ব্যতিরেকে উহা আপন ক্ষমতায় করিতে পারে না। সময়-বিশেষে যদি আমাদের পদ-চালনা করা বা নিদ্রা যাওয়া অভ্যাস হয়, তবে সেই অভ্যাসের প্রবর্ত্তক —আত্মা মূলে অধিষ্ঠিত থাকাতেই সে অভ্যাস জীবন ধারণে সমর্থ হয়। এ স্থলে মনে রাখা কর্ত্তব্য যে, আত্মা যখন এই রূপে আপন কার্য্যের ভার, প্রকৃতির স্কন্ধে বা কালের স্কন্ধে সমর্পণ করে, তখন তাহাতে আত্মার কেবল অধ্যক্ষতা মাত্র থাকিলেই

হইল, আত্মাকে স্বহস্তে সে কার্য্য লইয়া পুনর্ব্বার বিব্রত হইতে হয় না। বীণাযন্ত্রে যে ব্যক্তির নিপুণতা জন্মিয়াছে, তিনি এদিকে বীণা বাদ্য করিতেছেন, ওদিকে কোন এক ব্যক্তির সহিত কথা কহিতেছেন—ইহা কিছুই বিচিত্র নহে; এখানে ইহা স্পষ্ট যে, আত্মার অধিষ্ঠান মাত্র থাকাতে প্রকৃতি তাহার আদেশ পালনে তৎপর হইতেছে, এই হেতু সে সময়ে আত্মা অন্য কার্য্যে মন দিতে অবকাশ পাইতেছে।

এ ক্ষণে বলিবা মাত্রই বুঝিতে পারা যাইবে যে, আত্মা স্বাধীন ভাবে যাহা চায় তাহাই প্রেমের আদর্শ, এবং প্রকৃতি যাহা চায় তাহাই ইন্দ্রিয়-সুখের আদর্শ; অথবা আমরা আত্মার বলে যাহা চাই তাহাই প্রেমের আদর্শ এবং প্রবৃত্তির বলে যাহা চাই তাহাই ইন্দ্রিয়-সুখের আদর্শ।

প্রকৃতির আকিঞ্চন তিন রূপ হইতে পারে, যথা—পূর্ব্ব অভ্যাসের অনুযায়ী, বর্ত্তমান উত্তেজনার অনুযায়ী ও ভবিষ্যৎ চরিতার্থতার অনুযায়ী; এতদনুসারে ইন্দ্রিয়

সুখের আদর্শকে তিন শ্রেণীতে বিভাগ করা গেল,—আনুপূর্ব্বিক, আনুসাঙ্গিক, এবং আনুশেষিক।

উদাহরণ;—আমাদের চক্ষুতে জ্যোতিঃ নিপতিত হইলে প্রথমতঃ এক প্রকার গতির অবস্থা অনুভুত হয়। ধ্বনিতে এবং জ্যোতিতে এ বিষয়ে বস্তুতঃ কোন প্রভেদ নাই,—কেবল ধ্বনিতে উক্ত গতির ভাবটি আরো কিছু স্পষ্টতররূপে প্রকাশ পায়। এই প্রকার গতির অবস্থা আনুপূর্ব্বিক হইলে, অর্থাৎ আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়ের পূর্ব্বাভ্যাসের অনুযায়ী হইলে, আমাদের পক্ষে তাহা সুখ-জনক হয়, তদপেক্ষা অতিরিক্ত হইলে অসহ্য হইয়া উঠে, তদপেক্ষা ন্যূন হইলে অতৃপ্তি-জনক হইয়া পড়ে। দ্বিতীয়তঃ;—দৃশ্য-পরিসর বিস্তৃতরূপে প্রতিভাত হয়। এই দৃশ্য-বিস্তৃতি বর্ত্তমানের আনুসঙ্গিক হইলে, অর্থাৎ বর্ত্তমান সম্বন্ধে উহার এদিক্ ওদিক্ পরস্পরের অনুযায়ী হইলে, উহা সুখ-জনক হয়। তৃতীয়তঃ,—উক্ত দৃশ্য দূরবর্ত্তী রূপে প্রতিভাত হয়, দূরে যাহা

অস্পষ্ট দেখায়, তাহা স্পষ্ট করিয়া দেখিতে আমাদের বাসনা হয় ; এবং দৃশ্য বস্তু সকল যদি এরূপ ভাবে অবস্থিত থাকে যে, উহারা পরম্পরা-ক্রমে নিকট হইতে দূরে অবস্থিত হইয়া স্পষ্টতা হইতে ক্রমশঃ অস্পষ্টতায় বিলীন হইয়াছে, তাহা হইলে সে বাসনা চরিতার্থতার পক্ষে সুবিধা হয় ; কেন না এ রূপ হইলে, দূর-বশতঃ যাহা অস্পষ্ট দেখায়, সমীপবর্ত্তী দৃশ্য-সকলের সহিত তাহার ক্রমান্বয়ে যোগ থাকাতে তাহা স্পষ্ট হয়। যথা—দুইটি অশ্ব যদি প্রথমেই বহু দূরে দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে অস্পষ্টতা-বশতঃ উহাদিগকে একটি অশ্ব বলিয়া মনে হইতে পারে ; কিন্তু যদি উহারা প্রথমে আমাদের নিকটে থাকিয়া পরে ক্রমে ক্রমে সেই দূর দেশে গিয়া উপনীত হয়, তাহা হইলে সে রূপ ভ্রমের আর সম্ভাবনা থাকে না ; কেন-না এ স্থলে পূর্ব্ব দৃশ্যের স্পষ্টতা-বশতঃ পর দৃশ্যের অস্পষ্টতা ঘুচিয়া যায়। কিন্তু ইহার বিপরীত এই দেখা যায় যে, যদি আমাদের চারি দিকে প্রাচীর উত্থিত হয়,

তাহা হইলে সেই প্রাচীরের বহির্দ্দেশ আ-মাদের দৃষ্টিতে—অস্পষ্টতা হইতেও অধম—একেবারেই শূন্যরূপে পরিণত হয়; এ অবস্থায় প্রাচীরের বহির্দ্দেশের অত্যন্ত অ-স্পষ্ট ভাবকে স্পষ্ট করিয়া দেখিবার বাসনা যাহা আমাদের মনে উদিত হয়, তাহা চরি-তার্থ হইবার উপায় না থাকাতে কাজেই আমাদের অতিশয় কষ্ট বোধ হয়।

গতির আনুপূর্ব্বিকতা হেতু আমাদের অন্তঃকরণে যে সুখানুভব হয়, কবিতাচ্ছন্দঃ ও গীত-প্রবাহ উভয়ই তাহার প্রমাণ দি-তেছে; ছন্দের হ্রস্ব দীর্ঘ এবং গীতের তাল মান আনুপূর্ব্বিকরূপে চলিতে থাকিলে, তাহা কেমন শ্রুতি-সুখের আস্পদ হয়; এবং অকস্মাৎ ছন্দঃ পতন বা তাল ভঙ্গ হইলে তৎক্ষণাৎ শ্রবণে কেমন আঘাত লাগে; এই জন্য এরূপ ঘটনা বিচিত্র নহে যে, সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে ঈষৎ নিদ্রাক-র্ষণ হইতেছে, ইতি মধ্যে তালভঙ্গ হও-যাতে নিদ্রা অমনি সচকিত হইয়া প্রস্থান করিল। যদি কেবল একটি মাত্রও সুস্বর

আমাদের কর্ণে প্রবেশ করে—যেমন কোকিলের পঞ্চম স্বর, তাহাও আনুপূর্ব্বিক তরঙ্গমালাচ্ছন্দে নাচিতে নাচিতে তথায় প্রবেশ করে, তাহার মধ্যেও ছন্দঃ ও যমক রহিয়াছে। বিস্তৃতির আনুসঙ্গিকতাতে যেরূপ সুখানুভব হয়, জীব-দেহের অবয়ববিন্যাসের প্রতি এক বার দৃষ্টিপাত করিলেই তাহা প্রকাশ পাইবে; যথা—শরীরের দক্ষিণ পার্শ্ব ও বাম পার্শ্ব পরস্পরের অনুযায়ী হওয়াতে তাহা হইতে যেমন এক যুগল শোভা বিনির্গত হয়, তাহার কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম হইলে সেরূপ কখনই সম্ভবে না। পুনশ্চ কোন সভামন্দিরের স্তম্ভশ্রেণী আনুসঙ্গিকরূপে সন্নিবেশিত থাকিলে তাহা দেখিতে কেমন মনোহর হয়: কবিতাচ্ছন্দে যেমন হ্রস্ব দীর্ঘ ব্যবহৃত হয়, এখানেও তেমনি প্রতি স্তম্ভের প্রস্থ পরিমাণ হ্রস্ব, দুই স্তম্ভের মধ্যগত ব্যবধানের প্রস্থ পরিমাণ দীর্ঘ, এই রূপ হ্রস্ব দীর্ঘ উপযুক্ত পরিমাণে গ্রথিত দেখিতে পাওয়া যায়। আনুসঙ্গিক অবস্থা সকলের মধ্যে সাদৃশ্য থাকিলেই

যে উহাদিগকে পরস্পরের অনুযায়ী বলিতে পারা যায় এমন নহে; কেশজালের কৃষ্ণ বর্ণ—মুখমণ্ডলের গৌর বর্ণের অনুযায়ী হইতে পারে, চন্দ্রের জ্যোৎস্না নিশান্ধকারের অনুযায়ী হইতে পারে, এই রূপ যাহার সঙ্গে যাহা সাজে তাহাতেই তাহার আনুসঙ্গিক অনুযায়িত্ব সিদ্ধ হয়। এতদুপলক্ষে কতিপয় মনোহর সংস্কৃত শ্লোক আছে, যথা "পয়সা কমলং কমলেন পয়ঃ পয়সা কমলেন বিভাতি সরঃ। মণিনা বলয়ং বলয়েন মণি র্মণিনা বলয়েন বিভাতি করঃ। ইত্যাদি। ইহার অর্থ এই যে, জল দ্বারা কমল, কমল দ্বারা জল, এবং জল ও কমল উভয় দ্বারা সরোবর শোভা পায়। মণি দ্বারা বলয়, বলয়ের দ্বারা মণি, ও মণি এবং বলয় উভয় দ্বারা করদেশ শোভা পায়; ইত্যাদি। দূর-প্রসারণ-মূলক আনুপূর্ব্বিকতা এবং আনুসঙ্গিকতা, উভয়ের যোগে যেরূপ সুখানুভব হয়, দিগন্ত-স্পৃষ্ট সমুদ্রের তীরে দাঁড়াইয়া সারি সারি পোতগণের একত্র প্রয়াণ দেখিলে, অথবা বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রোপরি

ব্যূহবদ্ধ সেনাগণের কৃত্রিম রণ যাত্রা দেখিলে, তাহা পষ্ট রূপে প্রতীয়মান হইবে।

এই রূপ দেখা যাইতেছে যে, ঘটনা-সকল—ভূত-পূর্ব্ব অভ্যাস, বর্ত্তমান উত্তেজনা, এবং ভবিষ্যৎ চরিতার্থতার উপযোগী হইলেই, আনুপূর্ব্বিক আনুসঙ্গিক এবং আনুশেষিক হইলেই, তাহা ইন্দ্রিয়-সুখের কারণ হয়।

ইন্দ্রিয়-সুখের মোহন-শক্তি অতিশয় বিস্ময়-জনক;—সুরূপ, সুরস, সুগন্ধ, সুস্বর, ইহারা বাহির হইতে আসিয়া ইন্দ্রিয়গণকে কেমন আশ্চর্য্য রূপে বিমুগ্ধ করে, এবং মনোদুর্গের গুপ্ত কপাট সকল কৌশলে উদ্ঘাটন করিয়া কেমন অবিবাদে তথাকার সমুদায় প্রদেশ অধিকার করিয়া লয়। বাহিরের সামগ্রী সকল কোথা হইতে আসিয়া আমাদের মনের সঙ্গে এমনি আশ্চর্য্য রূপে মিসিয়া যায় যে তাহাদিগকে আর পর বলিয়া বোধ থাকে না। এই রূপ ইন্দ্রিয় সুখ অতীব উপাদেয় বটে তাহার আর সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহা যে পর্য্যন্ত না

আর এক উচ্চতর সুখে গিয়া পর্য্যাপ্ত হয়, সে পর্য্যন্ত তাহার মর্ম্মনিহিত একটি গূঢ় দোষের কিছুতেই নিরাকরণ হয় না। ইন্দ্রিয় সুখের একটি প্রধান দোষ এই যে তাহার উপর আমাদের কিছু মাত্র কর্ত্তৃত্ব চলে না; বিষয়-সকল যদি অনুকূল হইল তবেই ভাল, নতুবা আমরা আপন ইচ্ছায় ইন্দ্রিয়-সুখ উৎপন্ন করিতে পারিনা; স্বাধীন ইচ্ছাকে অপদস্থ করিয়াই ইন্দ্রিয়-সুখ মানস-ক্ষেত্রে সমাগত হয়; ইন্দ্রিয়-সুখে বিষয়েরই গুণ প্রকাশ পায়, আমাদের আপনাদের গুণ কিছুমাত্র প্রকাশ পায় না। এই হেতু আমাদের মনের বেগ ইন্দ্রিয়-সুখ হইতে আরো এক উচ্চ প্রদেশে উঠিতে সর্ব্বদাই আস্ফালিত হইয়া থাকে। যখন কোন একটি মধুর গীতধ্বনি আমাদের কর্ণগোচর হয়, তখন কি—কেবল সেই ধ্বনি মাত্রের প্রতি আমাদের মন বদ্ধ থাকে? কখনই না; সুশ্রাব্য ধ্বনিটি উপলক্ষ মাত্র, পরন্তু আমাদের লক্ষ—ইন্দ্রিয়ের সহিত যাহার কোন কালে কোন সম্পর্ক নাই—

সেই সকল অন্তর্নিহিত ভাবের দিকেই বিশেষ অনুরাগের সহিত প্রত্যাবৃত্ত হয়; সেই মধুরনিনাদ শ্রবণে হয় ত মনঃ-শয্যা-শায়ী কত শত ভুত-পূর্ব্ব ঘটনা শোভন বেশে উদ্বোধিত হয়, এবং আমাদের মানস ভৃঙ্গ সকলের মধ্য হইতে মর্ম্ম-রস চয়ন করত প্রেম-সিন্ধুতে নিমগ্ন হয়। অবশেষে ইহা বলা বাহুল্য যে, যেমন তান্ত্রিকেরা কল্পনাকে সহায় করিয়া মন্ত্র পাঠ দ্বারা পেয় সুরা শোধন করে, সেই রূপ প্রেম দ্বারা ইন্দ্রিয়-সুখ শোধিত হইলেই তাহার অন্তর্গত দোষ-সকলের খণ্ডন হইয়া যায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

উপসংহার।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে যে সকল বিষয় বলা হইয়াছে, তাহা এক্ষণে একত্র করিয়া সকলের সার মর্ম্মের প্রতি প্রণিধান করা যাইতেছে। আমরা বর্ত্তমান কাণ্ডের প্রথ-

মাবধি মূল-তত্ত্বসকল অবলম্বন করিয়া প্রবৃত্ত হইয়াছি; ইহার কারণ এই যে, পারমার্থিক ভক্তি বৃত্তিকে উপযুক্ত রূপে চরিতার্থ করিতে হইলে অগ্রে তত্ত্ব-জ্ঞান আবশ্যক। তত্ত্ব-জ্ঞান যদি জন-সমাজ হইতে কোন কালে তিরোহিত হয়, তাহা হইলে ভক্তদিগের পৌত্তলিকতা এবং জ্ঞানীদিগের উপহাস, দুয়ের মধ্যে পড়িয়া ধর্ম্মের স্ফূর্ত্তি অচিরাৎ অবসন্ন হইয়া পড়ে। কিন্তু অগ্রে যদি জ্ঞান-ক্ষেত্র যথোচিত রূপে কর্ষণ করিয়া তাহাতে ভক্তি-বীজ বপন করা যায়; তাহা হইলে আপাততঃ কিঞ্চিৎ কাল-বিলম্ব হইলেও, যথাকালে যখন তাহা হইতে ধর্ম্ম-তরু উদ্ভূত হয়, তখন তাহা অতীব সতেজ হইয়া আলোকে উত্থান করে। তত্ত্ব-জ্ঞানের প্রণালী অতীব সংক্ষেপে বলিয়া দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহার অনুশীলন প্রতি জনের যত্ন ও সামর্থ্যের উপর নির্ভর করে। দেকর্ত্তা নামক ফরাশিশ দেশীয় একজন প্রধানতম পণ্ডিত, তত্ত্ব-জ্ঞানের এই একটি সঙ্কেত-বচন ইউরোপ দেশে প্রচলিত করিয়া যান

যে, "আমি চিন্তা করি, এই হেতু আমি আছি"। এ বচনটির বাহ্য বেশ কিঞ্চিৎ অদ্ভুত বটে; কিন্তু ইহার ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলে এই রূপ দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, উহাতে জীবত্মার কেবল নয়, কিন্তু পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সম্বন্ধ বিষয়েরও পথ-সন্ধান বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। উক্ত সংক্ষিপ্ত বচনটিকে এই রূপে বিস্তার করা যাইতে পারে, যথা,—স্বকীয় গুণ-দ্বারা বস্তুর অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়, চিন্তা আত্মার স্বকীয় গুণ, এই হেতু চিন্তা দ্বারা আত্মার অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। যদি কখন আমার মনোমধ্যে এ রূপ সংশয় উপস্থিত হয় যে, আমার এই জীবাত্মা আছে কি না, তবে আমি কাহার নিকটে তাহার সিদ্ধান্ত জিজ্ঞাসা করিব? কেহ বলেন জীবাত্মা আছে, কেহ বলেন নাই। "অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে।" যিনি বলেন "জীবাত্মা আছে" তাঁহার এই কথা মাত্রে আমি যদি সায় দিয়া যাই, তবে তদ্বিষয়ে আমি নিজে কি আর জানিলাম? যিনি বলেন "জীবাত্মা নাই"

তাঁহারও কথা-মাত্রে যদি আমি সায় দিয়া যাই, তাহা হইলেও ঐ রূপ। এই রূপ করিয়া অবশেষে পাওয়া যাইবে যে, বস্তুর ও অবস্তুর ভাব কাহারো মুখের কথাতে উদ্ভূত হয় না, উহা আমাদের আপন আপন অন্তরেই রহিয়াছে; সুতরাং সংশয়-কর্ত্তার কর্ত্তব্য যে, সেই বস্তু-ভাবের সহিত আপনাকে মিলাইয়া দেখা—যে, আমি বস্তু কি অবস্তু—আমি আছি কি নাই? এ-ভিন্ন বর্ত্তমান প্রশ্ন মীমাংসার আর উপায়ান্তর নাই। অন্যের সহিত আলাপ করিতে হইলে বাক্য ব্যবহার করিতে হয়, কিন্তু আপনার সহিত আলাপ করিতে হইলে—বাক্যের অর্থ-স্বরূপ পদার্থ-সকলের—আন্তরিক তত্ত্ব-সকলের—শরণাপন্ন হইতে হয়, এখানে আর বাক্য-ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না। ভাব-সাগরে সন্তরণ দিতে হইলেই বাক্যাদি অবলম্বন আবশ্যক হয়, কিন্তু ভাব-সাগরে নিমগ্ন হইতে হইলে ও-সকলেতে তেমন আর প্রয়োজন থাকে না। অপিচ, সর্ব্বদাই আমরা চিন্তা করি; আমরা

মনে মনে নাও যদি বাক্য উচ্চারণ করি, তথাপিও আমাদের চিন্তার বিরাম হয় না। অতএব বক্যাদি কোন কাল্পনিক আবির্ভাবের অবলম্বন দ্বারা নহে, কিন্তু অন্তরের বাস্তবিক ভাব বা সত্তা অবলম্বন করিয়াই নিগূঢ় চিন্তায় প্রবৃত্ত হয়। এই হেতু "আমি চিন্তা করিতেছি" ইহা মানিতে হইলে "আমি আছি" এই রূপ আপন সত্তাকেও সঙ্গে সঙ্গে মানিতে হয়। আবির্ভাব যেমন ভাবকে অবলন করিয়া থাকে, গুণ যেমন বস্তুকে অবলম্বন করিয়া থাকে, সেই রূপ চিন্তা আত্মাকেই অবলম্বন করিয়া থাকে। পুনশ্চ, আপন সত্তাকে মানিতে হইলে, পরম সত্তা পূর্ণ-সত্তা ও মূল-সত্তা পরমেশ্বরকে মূলাধার বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ঙ্গম করিতে হয়। সামান্য-বিশেষ, বস্তু-গুণ, কার্য্য-কারণ, এই যে তিনটি ভাব,—ইহারা, একমেবাদ্বিতীয়ং পরম বস্তু ও মূল কারণ পরমেশ্বর কর্তৃক, আমাদের আত্মাতে ভাব-রূপে এবং জড় জগতে অন্ধ প্রকৃতি রূপে বিতরিত হওয়াতেই, আমরা আপন আপন সত্তা উপলব্ধি

করিতেছি এবং জড় বস্তু-সকল অচেতন হইয়াও সচেতনের ন্যায় যথা-নিয়মে কার্য্য করিতেছে। অতএব "আমি আছি কি না" এ প্রশ্ন মনুষ্য বিশেষকে বা গ্রন্থ বিশেষকে জিজ্ঞাসা করা বৃথা, কেবল—অন্তরতম পরমাত্মার মুখ-জ্যোতিতেই এ প্রশ্নের সমুচিত মীমাংসা হইতে পারে, অন্য কোন রূপেই নহে। অপিচ, যথার্থ সত্য-জিজ্ঞাসু হইয়া আপন আত্মার প্রতি দৃষ্টি করিলেই পরমাত্মার সহিত আত্মার যে সম্বন্ধ তাহাও আমাদের সমক্ষে প্রকাশ পায়; তখন দেখিতে পাই যে, ঈশ্বরের সহিত আমরা ধ্রুব ও নিত্য সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইয়া আছি, এবং তদ্দৃষ্টে আমরা অনুপম আনন্দে পুলকিত হই।

মনুষ্যের ভোগ্য সামগ্রী তিন প্রকার—বিষয়-সুখ আত্মপ্রসাদ এবং ব্রহ্মানন্দ; ইহার মধ্যে বিষয় সুখের সঙ্গে দুঃখ রহিয়াছে, আত্মপ্রসাদের সঙ্গে বিষাদ রহিয়াছে, কেবল ব্রহ্মানন্দই কণ্টক-শূন্য। বিষয়-সুখ—সমুদায় আত্মাতে নহে—কেবল

আত্মার বৃত্তি বিশেষেই অধিকার পায়; যে সময়ে এক বৃত্তির উত্তেজনা, সে সময়ে অপরাপর বৃত্তি সকলের অবমাননা,—বিষয়-সুখ দ্বারা আত্মার মধ্যে এই রূপ গৃহ-বিচ্ছেদের সূত্র-সকল সমানীত হয়। বিষয়ের দুর্নিবার উত্তেজনা হইতে মুক্তি লাভ করিয়া যত আমরা স্ববশ হই, ইন্দ্রিয়-সুখ অতিক্রম করিয়া যত আমরা বিশুদ্ধ প্রেমের দিকে অগ্রসর হই, ততই আত্মপ্রসাদ আসিয়া আমাদের অন্তরাকাশে শুভ্র জ্যোতি বিকীর্ণ করে। কিন্তু সম্পূর্ণ মুক্তি যে হেতু কোন কালেই আমাদের হস্তগত হইতে পারে না, এই হেতু বৈরাগ্য-জনিত বিষাদ আত্ম-প্রসাদকেও সময়ে সময়ে রাহুগ্রস্ত করিতে সুযোগ পায়। ইন্দ্রিয়-সুখের যে কিছু গূঢ় অভাব, প্রেম দ্বারা তাহা আপূরিত হইতে পারে,—সত্য; ইহা সত্য যে আমরা প্রেমে অত্যন্ত মগ্ন হইলে ইন্দ্রিয়-জনিত দুঃখ ক্লেশ ভুলিয়া থাকিতে পারি—এমন কি প্রেমের তরে আবশ্যক হইলে মৃত্যুকেও আলিঙ্গন করিতে কুণ্ঠিত না হইতে পারি। কিন্তু এই

মনুষ্য-জীবনে এ রূপ আত্যন্তিক প্রেম কি কখনো সুলভ হইতে পারে? অপিচ সৃষ্ট জীবের পক্ষে কোন কালেই কি এ-রূপ সম্ভবে যে, প্রেমের যৎপরোনাস্তি পরা কাষ্ঠা অভ্যুদিত হইয়া তাহার সমুদায় অভাবকে একেবারে গ্রাস করিয়া বিলুপ্ত করিয়াছে? কখনই না। পূর্ণ প্রেমের প্রস্রবণ কেবল একমাত্র পরব্রহ্মেতেই সংগোপিত রহিয়াছে, আর কাহারও তথায় হস্ত-ক্ষেপ করিবার সামর্থ্য নাই। ইন্দ্রিয়-সুখের আনুষঙ্গিক অভাব-সকল প্রেম দ্বারা কথঞ্চিৎ রূপে পূরিত হইতে পারে—সত্য; কিন্তু আমাদের প্রেমের এই যে অভাব যে—উহা পরিমিত, এ অভাব কি প্রকারে পূর্ণ হইবে? ইহার এক মাত্র উপায়—ঈশ্বরোপাসনা; আমরা আপনার ক্ষুদ্র ভাব পরিত্যাগ করিয়া যদি সেই অক্ষয় আনন্দ-স্বরূপের প্রতি লক্ষ্য নিবিষ্ট করিতে পারি, তাহা হইলেই আমাদের নিত্য শান্তি হয়—অন্য কোন প্রকারেই নহে। ঈশ্বরের প্রসন্নমুখ সন্নিধানেই,—ছল নাই, চাতুরী নাই, কপটতা নাই, ঠিক আমরা

যে রূপ সেই রূপ হইয়া অনুপম আনন্দ ও শান্তি লাভে কৃতার্থ হইতে পারি।

উপরের পরিচ্ছেদে যাহা বলা হইল, তাহার মর্ম্ম এই যে, বিষয়-সুখ এরূপ পরিমিত সামগ্রী যে তাহা-দ্বারা আত্মার ক্ষণোত্তেজিত বৃত্তিবিশেষ ভিন্ন আমাদের সমুদায় আত্মা কখনই চরিতার্থ হইতে পারে না। বিষয়-সুখের এই রূপ লক্ষণ করা যাইতে পারে যে, কতকমাত্রায় সুখ—যাহার চারি দিক্ দুঃখ দ্বারা পরিবেষ্টিত; যথা, ভোজন করিবার যে সুখ তাহা অতি অল্প ক্ষণেই অবসান হইয়া যায়, সুতরাং ভোজন-সুখই যাহার সর্ব্বস্ব তাহার পদে পদে দুঃখ গ্রথিত রহিয়াছে। বিষয়-সুখের চারি দিকের এই যে অভাব, ইহা কেবল বিশুদ্ধ প্রেম ও আত্ম-প্রসাদ দ্বারাই অপহৃত হইতে পারে, বারম্বার বিষয় ভোগ দ্বারা নহে; "ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভুয় এভাবির্দ্ধতে।" মনুষ্য-সমাজের প্রতি কিঞ্চিন্মাত্র কটাক্ষপাত করিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, মনুষ্যেরা

অধিকাংশ কাল সাংসারিক কিম্বা সামাজিক আলাপ ও অনুষ্ঠান লইয়াই ব্যাপৃত থাকে,—ভোজনাদির সুখ ভোগে অতি অল্প ক্ষণই নিমগ্ন থাকে; এই রূপ আলাপ এবং অনুষ্ঠানকে প্রকৃত রূপে নির্ব্বাহ করা অন্ধ প্রবৃত্তির কার্য্য নহে, ইহাতে ধর্ম্ম-বুদ্ধির আবশ্যকতা হয়; এবং প্রবৃত্তির প্রতিকূলে আমরা ধর্ম্ম-পথে যত অগ্রসর হই, তত আমাদের হৃদয়ে বিশুদ্ধ প্রেমের পরিচালনা হয় ও আত্মপ্রসাদের সঞ্চার হয়; এবংএই বিশুদ্ধ প্রেম ও আত্মপ্রসাদ হৃদয়াভ্যন্তরে সঞ্চিত থাকিলে বিষয়-সুখের অস্তগমন সময়েও দুঃখান্ধকার তথায় অধিকার পায় না। কিন্তু ইহারও উপরে, আরও এই দেখা যায় যে, নিগূঢ় অধ্যাত্ম-যোগে আমাদের প্রেম যেমন প্রকৃতরূপে চরিতার্থ হয়, সামাজিক আলাপাদিতে উহা সে রূপ হইতে না পারিয়া অচিরাৎ ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়ে। সীমা-বিশিষ্ট যাহা কিছু, তাহা শীঘ্রই পুরাতন হইয়া যায়; কিন্তু অসীম প্রত্যহই নূতন। কেহ যাহা চক্ষে দেখে

নাই, কর্ণে শুনে নাই,—অসীমের মধ্যে সেই সকল প্রেমের ব্যাপার গূঢ়-ভাবে অবস্থিতি করিতেছে। একটি সুমধুর গীত আমাদের কর্ণে সুধা ঢালিয়া চলিয়া যায়, আর—আমাদের মন অমনি অসীমের দিকে চক্ষু ফিরায়। একটি কোন নূতন আনন্দ উপস্থিত হয়; অমনি, অসীম কোথায়—তাহার তত্ত্ব আনিতে মানস-চক্ষু চতুর্দ্দিকে প্রেরিত হয়। এই রূপ, যাহা কিছু নূতন, যাহা কিছু আশ্চর্য্য, যাহা কিছু অসাধ্য-সাধন; সকলই আমাদিগকে অসীমের দিকে লইয়া যাইতে—প্রস্তুত বিমানের ন্যায়—উদ্যত রহিয়াছে। সীমা-বিশিষ্ট বস্তু-সকল আমাদের প্রেম-ক্ষুধার উদ্দীপন করিতে পারে বটে; কিন্তু অসীম ব্যতীত আর কেহই সে ক্ষুধার শান্তি করিতে পারে না। "যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখং।" অতএব সিদ্ধান্ত হইল যে আত্ম-প্রসাদ বিষয়-সুখ হইতে দুঃখ অপহরণ করে এবং ব্রহ্মানন্দ আত্মপ্রসাদ হইতে বিষাদ অপহরণ করে।

দ্বিতীয় প্রস্তাব। অধ্যাত্ম-যোগ তিন প্রকার,—জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, এবং কর্ম্ম-যোগ। জ্ঞান-যোগ—যোগের প্রথম সোপান, এই জন্য ইহাতে যোগের ভাব অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণে বর্ত্তে। পরমাত্মা, জীবাত্মা, জড় বিষয়,—এ-সকল তত্ত্ব জ্ঞান-চক্ষুর গোচরে পরস্পর হইতে অপেক্ষাকৃত বিচ্ছিন্ন ভাবে প্রকাশ পায়। ভক্তি-যোগ—যোগের দ্বিতীয় সোপান; ইহাতে পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার যোগ, এবং জীবাত্মার সহিত বিষয়ের যোগ, সুন্দর-রূপে পরিস্ফুট হয়; কিন্তু এখানেও যোগের ভাব সম্পূর্ণ হয় না। ভক্তিযোগের প্রণালী এই যে, যখন ঈশ্বরকে ভজনা করিতেছি, তখনকার সে ভাব স্বতন্ত্র; এবং যখন সংসারে লিপ্ত হইতেছি, তখনকার ভাব স্বতন্ত্র; সুতরাং অধ্যাত্ম-সম্বন্ধ এবং সংসার-সম্বন্ধ, এ দুই সম্বন্ধ ভক্তি-যোগেও পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন রহিল। জ্ঞান-কাণ্ডে তত্ত্ব-সকল বিচ্ছিন্ন ভাবে ছিল, ভক্তি-কাণ্ডে তাহাদের মধ্যে সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইল; কিন্তু ইহাতেও আধ্যাত্মিক

ও সাংসারিক এই দুই প্রকার সম্বন্ধের মধ্যে বিছিন্নতা দৃষ্টিগোচর হইতেছে। পরন্তু আমরা যদি অধ্যাত্ম-সম্বন্ধ অনুসারে সংসার-সম্বন্ধ-সকলকে নিয়মিত করিতে পারি, তাহা হইলে যোগের কথিত অভাবটি আর থাকিতে পায় না—তাহা হইলে অধ্যাত্ম-যোগ ও সংসার-যোগ উভয়ই একতানে মিলিত হইয়া মুক্তির পথকে অতীব পরিষ্কৃত করিয়া দেয়। অবশিষ্ট কর্ম্ম-কাণ্ডে অধুনোক্ত বিষয় আরো সুস্পষ্ট হইবে। এক্ষণে যাহা বলা হইল, তাহা এই রূপে সংক্ষেপে নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। যথা—

প্রথম বিষয়। পরমাত্মা......জীবাত্মা........বাহ্যবস্তু

দ্বিতীয় বিষয়। আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ ....বৈষয়িক সম্বন্ধ

তৃতীয় বিষয়। উভয়ের মধ্যে যোগ সংস্থাপন

ইহার মধ্যে, প্রথম বিষয়ের মূল তত্ত্ব জ্ঞান-কাণ্ডে সমালোচিত হইয়াছে, দ্বিতীয় বিষয়ের মূল আদর্শ অধুনা সমালোচিত হইল, তৃতীয় বিষয়ের মূল নিয়ম কর্ম্মকাণ্ডে সমালোচিত হইবে।

ইতি ভোগ-কাণ্ড সমাপ্ত।